International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-V, September 2021, Page No. 21-32
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i5.2021.21-32

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ- একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

ড. অরূপ অধিকারী
শিক্ষক, গোলগ্রাম গোলাম ইমাম হাইস্কুল (উ.মা.) গোলগ্রাম, রায়না, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Rabindranath Tagore is a thinker who describes the philosophy through his poetic images. His philosophy is incomplete without making a mention of his humanistic thought. Throughout his thought there are concepts about humanity. In his philosophy man has been given a prime grade. He gives to man a distinct status. He thinks that religion is nothing but humanity. According to him every man creativity and this creativeness is religion. Rabindranath describes man from two aspects- individual aspect and universal aspect. Individual man are limited to space and time. But universal man is beyond space and time. The goal of universal man is search of truth. In the present Article, Tagore's concept of Humanism will be exposed on the basis of authentic sources.

Keywords: Rabindranath (রবীন্দ্রনাথ***),***ইমান্যুয়েল কান্ট ***(Imanuel kant), Humanism (***মানবতাবাদ), মনুষ্যত্ব ***(Manness), Individual Sell*** (ব্যক্তি আমি), ***Universal self*** (বিশ্ব আমি), ***(Ideal)*** শ্রেয় (Virtue), প্রেয় ***(Goodness),*** ভূমা ***(ubiquitous).***

মানবতাবাদ হল এমন একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী যা মানব প্রকৃতির অস্তিত্ব, মানবিক নীতি ও মানবিক বিষয়গুলি নিয়ে সবিচার আলোচনা করে ও সেগুলির গুরুত্ব অনুধাবনের প্রচেষ্টা করে। রবীন্দ্রনাথের ভাবনাতে বিভিন্ন ভাবে মানবতার প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ মূলে কবি। তনে তাঁর চিন্তাজগৎ কেবলমাত্র কাব্যের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। সাহিত্যিক, নাট্যকার, প্রবন্ধকার, গল্পকার, সঙ্গীতজ্ঞ ও দর্শনচিন্তক হিসাবে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তাঁর বিচিত্র সৃষ্টিতে মানবতা বিষয়ক চিন্তা যেভাবে প্রকটিত হয়েছে তা বর্ত্মান নিবন্ধে মনোজ্ঞভাবে উপস্থাপন করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের পূজারী। তাঁর মতে মানুষ আছে বলেই জগৎ সংসার এতো পূর্ণ এবং সুন্দর। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি চিত্তাকর্ষক উপমা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "একটি গোলাপফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে সুন্দর যে- মানুষ তার কেবল পাপড়ি না বোঁটা না, একটা সমগ্র আন্তরিক

সার্থকতা পেয়েছে।"[১] মর্মার্থ হল- মানুষ আছে বলেই গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য্যের অর্থ রয়েছে, অন্য প্রাণীর কাছে ঐ সৌন্দর্য্যের কোনো অর্থ নেই। 'তাঁর আমি' কবিতাতে এই ভাবনারই প্রকাশ ঘটেছে-

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে তাকিয়ে বললুম 'সুন্দর'
সুন্দর হল সে।[২]

তুল্যভাবে মানুষ আছে বলেই জগতের এতো সৌন্দর্য্য রয়েছে। মানুষ না থকলে জগৎ প্রায় সৌন্দর্য্যহীন হবে। পাশ্চাত্য বিচারবাদী দার্শনিক ইমান্যুয়েল কান্ট বলেছিলেন, আমরা মানবশূন্য দেশ- কালের কথা ভাবতে পারি, কিন্তু দেশ-কাল ব্যতিরিক্ত মানুষের কথা চিন্তা করতে পারি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থলে তার সৃষ্টির তার সৃষতির ছাপ রেখেছে বলেই দেশের তথা জগতের অস্তিত্ব সার্থকতা পেয়েছে।[৩] তবে কান্ট ও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রেক্ষিত ভিন্ন। সারকথা হল, রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষ তার সৃজনী চিন্তার ছাপ পৃথিবীর সর্বাংশে রেখেছে এবং তাই পৃথিবী সৌন্দর্যময়ী ও পরিপূর্ণ হয়েছে। মানুষের এই সৃজনত্বকেই রবীন্দ্রনাথ ধর্ম বলেছেন। তাঁর মতে ধর্ম হল স্বরূপ বাঃ স্বভাব।[৪] মানবস্বরূপ অর্থাৎ মানবত্বই ধর্ম। যে সকল কর্মকর্তব্যসমূহ মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হতে সহায়ক হয় সেইসব কর্তব্যকর্মকে ধর্ম বলে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের দুটি দিকের কথা বলেছেন- একটি দিক হল ব্যক্তিগত এবং অন্য দিকটি হল ভূমাগত।[৫] দুটি ভাবই মানুষের মধ্যে বর্তমান। ব্যক্তিগত ভাবটি হল তার বাহ্যিক দিক এবং ভূমাগত ভাবটি হল তার অন্তরের দিক। বাহ্যিক দিক হতে সে একজন ব্যক্তিমানুষ, কিন্তু অন্তরের দিক হতে সে সমগ্র মানুষ। মানুষ যখন তার অন্তর্জাত প্রেরণা হতে বাহা অস্তিত্বকে অতিক্রম করে অমরত্বের পথে, প্রকৃত সত্যের তথা শ্রেষ্ঠত্বের পথে, প্রকৃত সত্যের তথা শ্রেষ্ঠত্বের পথে অগ্রসর পথে নিয়ে যেতে প্রয়াস করে এবং সার্বিক আনন্দক সত্য করে তুলতে চায়।[৬] কিন্তু মানুষ যদি কেবল তার বাহ্যিক দিক তথা ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে যেখানে সে দেশগত ও কালগত পরিচ্ছেদে আবদ্ধ থাকতে চায় তাহলে সে প্রকৃত সত্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।[৭] তাই মানুষের উচিত বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করে, ব্যক্তিগত পরিচ্ছেদকে অতিক্রম করে পূর্ণতার পথে, বিশ্বমানতার পথে অগ্রসর হওয়া।[৮]

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে ব্যক্তিমানুষ ও সমগ্র মানুষ- এই দুটি ভাব মানুষের মধ্যে থাকে এবং দুটির মধ্যে প্রভেদও রয়েছে। বক্তিমানুষ তার ব্যক্তিগত গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। ঐ সীমার মধ্যে স্বে তার নিজের বিষয় সম্পত্তি, জ্ঞান, কর্ম, সাহিত্য প্রভৃতি মধ্যে মগ্ন থেকে সাধারণ জীবরূপে বেঁচে থাকতে চায়?[৯] কিন্তু সমগ্র মানুষ কেবলমাত্র বিষয় চিন্তাতে আবদ্ধ না থেকে ব্যক্তিগত বৈষয়কতাকে অতিক্রম করে মহাজীবনের মধ্যে বাঁচতে চায়। তার পক্ষে লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, মৃত্যু-অমরতা প্রভৃতি সমবুদ্ধির বিষয় হয়।[১০] ঐ মহাজীবনেই সে আনন্দ ও আত্মোপলব্ধি করে। রবীন্দ্রনাথের মতে ব্যক্তি মানুষের অভিমুখ ক্ষুদ্র আমিত্বের তথা স্বার্থের দিকে, কিন্তু সমগ্র মানুষ যার মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব রয়েছে তার অভিমুখ বিশ্ব আমি তথা আত্মত্যাগের দিকে।[১১] ব্যক্তিমানুষ আত্মব্যাপ্তির মাধ্যমেই স্বকীয় সীমাকে অতিক্রান্ত করে বৃহৎ মানুষ বা সমগ্র মানুষে উপনীত হতে পারে। দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-অর্থ প্রভৃতি পরিচ্ছেদের কারণে বাহ্যিক দিক

হাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাক্তিমানুষ রয়েছে, কিন্তু অন্ত্রে রয়েছে সমস্ত পরিচ্ছেদরহিত এক মানবসত্তা।[১২] এই অন্ত্রের মানুষকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সমগ্র মানুষ। অন্তরের এই সমগ্র মানুষ বর্তমানে বিষয়বস্তু আহরণের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে আত্মত্যাগের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয় এবং ঐ জীবনকে আঁকড়ে ধরেই সে বাঁচতে চায়।[১৩]

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, বাহ্যিক দিক হতে অন্তরের দিকে অগ্রসর হয়ে মানুষের যে স্বরূপোপলব্ধি ঘটে তা স্বাভাবিকভাবেই হয়। যে জগতে সমস্ত পরিচ্ছেদকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবতায় মানুষের উত্তরণ ঘটে এবং সেখানেই তার সৌন্দর্য্য। তার কৈবল্য।[১৪] সে উপলব্ধি করে বাহ্য কর্মকাণ্ড অপস্যা নয়, বরং অন্তরের সত্যোপলব্ধিই অপেক্ষা উত্তর মীমাংসা তথা বেদান্ত দর্শের জ্ঞানকান্ডকেই রবীন্দ্রনাথ অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয়।বেদের মধ্যে জ্ঞানকান্ড ও কর্মকান্ড-এরূপ ভেদ রয়েছে। বেদের কর্মকাণ্ডকে ভিত্তি করে পূর্বমীমাংসা তথা মীমাংসা দর্শ্ন এবং জ্ঞান কান্ডকে ভিত্তি করে উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন গড়ে উঠেছে। কর্মকাণ্ডীরা কর্মজন্য ফলকে মুক্তির কারণ বলেন। আর জ্ঞানকান্ডীর মতে কর্মসমুচ্চিত জ্ঞান মোক্ষের উপকারক হয়। জ্ঞানকান্ড তথা অদ্বৈত বেদান্ত মতে, একত্বজ্ঞান হলে বহুত্বজ্ঞানের বাধ হয়। রবীন্দ্রনাথও যেন একইভাবে বলেছেন, যখন মানুষ একত্বের মধ্যে বহুত্বকে অর্থাৎ নিজের মধ্যে মানবজাতিকে এবং সমগ্র মানবজাতির মধ্যে নিজেকে অনুভব করে তখনই তার প্রকৃত সত্যের জ্ঞান হয়।[১৬] এখন প্রশ্ন হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ কি তাহলে অদ্বৈতবাদী? রবীন্দ্রনাথ অদ্বৈতবাদী কিনা তা। বিচারের অপেক্ষা রাখে। যেহেতু তিনি নিজের মধ্যে সমগ্রের জ্ঞানকে মুক্তির পথ বলেছেন তাই তাঁকে অদ্বৈতবাদী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ স্বীকার করেছেন। তিনি মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে মেনেছেন এবং পরমাত্মাকে নৈর্ব্যক্তিক বলেছেন। ঐ পরমাত্মা সকল প্রকার বিশেষণবর্জিত ও ভেদরহিত। মানুষ পরমাত্মাকে বিভিন্ন বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট করে দেখে।[১৭] সুতরাং রবীন্দ্রনাথের একথা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে আত্মার দ্বৈততা মেনেছেন। তাছাড়া শুদ্ধাদ্বৈতাবাদের যে মূল কথা, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই এবং ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু- এই মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানবতা বিষ্যক চিন্তা কতখানি তুল্য তা বিচক্ষণ পাঠকবর্গই বিচার করিবেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ তার সৃষ্টির ছাপ রেখেছে এবং মানুষের এই সৃষ্টি স্থলবিশেষে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু তিনি জগৎপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতিকে সর্বাংশে এক বলে মনে করেননি।[১৮] তাঁর মতে ঈশ্বরই মানুষের সঙ্গে জগতের সম্পূর্ণ ঐক্য গড়ে তোলেননি। ঈশ্বর স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মানুষের মধ্যে যে অহংকার সৃষ্টি করেছেন তার দ্বারাই বিশ্বপ্রকৃতি হতে মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। তবে রবীন্দ্রনাথ এই অহংকারের উপযোগিতাকে অস্বীকার করেননি। তাঁর মতে অহংকার আছে বলেই মানুষ একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র এবং ঐ স্বাতন্ত্র্যতার অবসান করে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে কিভাবে একটি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য গড়ে তোলা যায় তার জন্য মানুষ নানা দেশে নানা প্রচেষ্টা করে চলেছে।[১৯] অহংকার আছে বলেই মানুষ তার স্বকীয় সৃষ্টির প্রতি অধিক যত্নবান হয়। এই সৃজনতার মধ্যেই রয়েছে মানুষের ইতিহাস। মানুষ বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা করে। মানুষের জ্ঞান, কর্ম প্রভৃতি প্রতিটি প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানোর প্রয়াস।[২০] বিভিন্নতা রয়েছে বলেই মানুষ অভিন্নতার দিকে এগিয়ে যেতে চায়। মানুষ সুখের মধ্যে সুখকে অনুসন্ধান করে না, আলোকের মধ্যে আলোর অনুসন্ধান করে না। তুল্যভাবে মানুষ অভিন্নতার মধ্যে অভিন্নতাকে অনুসন্ধান করে না। কারণ অভিন্নতা থাকলে অভিন্নতাকে পাওয়ার প্রশ্ন আসে না। দুঃখ আছে বলেই মানুষ সুখান্বেষণের প্রতি যত্নবান হয়, অন্ধকার আছে বলেই আলোর গুরুত্ব আছে। যদিও অন্ধকার বলতে আলোকাভাবকেই বোঝায়।

আলোকাভাবের অতিরিক্ত অন্ধকার বলে কিছু নেই, এটি একদেশীদের মত। অভিপ্রায় হল যে, বিচ্ছিন্নতা আছে বলেই মানুষ ঐক্যবিধানের দিকে অগ্রসর হয়। ঐক্যের ভাব থাকলে ঐক্যবিধানের কোনো অবকাশ থাকে না। যেখানে ঐক্যের অভাব থাকে সেখানেই ঐক্যবিধানের অবকাশ থাকে। অনৈক্য তথা বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করে অবিচ্ছিন্নতা প্রাপ্তির মধ্যেই রয়েছে পূর্ণতা। আর ঐ বিচ্ছিন্নাতা অহংকারজন্য। রবীন্দ্রনাথের মতে, অহংকার যেমন একদিকে মানুষকে স্বতন্ত্র করেছে। তেমনই আবার তা মানুষের মধ্যে ঐক্যবিধানের প্রবর্তক। তিনি বলেছেন, "অহংকার না হলে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হলে মিলন হয় না, মিলন না হলে প্রেম হয় না।"[২১] সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে বিচ্ছিন্নতা ও ঐক্য পরস্পর সাপেক্ষ। আমাদের সকল সৃষ্টি বিচ্ছিন্নতা ও ঐক্যের মধ্যে সঙতিবিধানের পক্ষে। এদের কোনো একটিকে ছেড়ে মানুষ থাকতে পারে না। ভেদ ও অভেদের মধ্যে একত্ব লাভের জন্যই মানুষের যাবতীয় প্রয়াস।[২২]

রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষ তার ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম করে সমগ্র মানুষ উপনীত হতে চায়, ইহা পূর্বে বলা হয়েছে। ঐ সমগ্র মানুষ আদর্শের অভিমুখী। আদর্শ মানুষের অপরাপর জৈবিক প্রয়োজন হতে ভিন্ন। এই আদর্শ বাইরে থেকে আসে না, এটি অন্তর্জাত।[২৩] আদর্শ একটি আন্তরিক নির্দেশ, যাকে পাশ্চাত্য বিচারবাদী কান্ট বলেছেন বিবেকের বাণী (Sound of Conscience)। এই নির্দেশ মানুষকে অবিচ্ছিন্নতার দিকে, পূর্ণতার দিকে, বিশ্বমানবতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।[২৪] অন্যদিকে ব্যক্তিমানুষের প্রবৃতি তার জৈবিক প্রয়োজনের দিকে। ব্যক্তি মানুষের মধ্যে 'আমি' ভাব প্রবল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'আমি'-র দুটি বিভাগ করেছেন- 'ছোট আমি' ও 'বড় আমি'। মানুষের মধ্যে যে আমি ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তাতে নিমগ্র থাকে তা 'ছোট আমি; এবং বৃহত্তর কল্যাণ চিন্তায় ব্যাপ্ত যে আমি তা 'বড় আমি'। এই 'বড় আমি'কেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বিশ্ব আমি' বা 'সমগ্র আমি' বাঃ বৃহৎ আমি'। তাঁর মতে 'আমিত্ব'-এর ব্যাপ্তির মাধ্যমে 'সমগ্র আমি' তথা 'বৃহৎ আমি'তে উপনীত হওয়া যায়। মানবসেবা তথা সমাজের হিতসাধনের মধ্য দিয়ে মানুষ সংকীর্ণ বা ব্যক্তি আমি-কে অতিক্রম করে 'বৃহৎ আমি' বা 'বিশ্ব আমি'তে পর্য্যবসিত হতে পারে। 'ব্যক্তি আমি'কে প্রসারিত করে ভূমা বা 'সমগ্র আমি'তে উপনীত হওয়াকেই রবীন্দ্রনাথ মুক্তি বলেছেন। তাঁর মতে সমগ্রের মধ্যেই মুক্তি। তাই তিনি বলেছিলেন-

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দয়
লভিব মুক্তির স্বাদ"।[২৫]

ভাবার্থ হল, সমগ্রে পর্য্যাবসানই মুক্তি। ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তাকে অতিক্রম করে সমগ্র মানুষের তথা সমাজের কল্যাণের মাধ্যমেই মুক্তি লাভ করা যায়। একেই রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রকৃত সত্য বলেছেন। তাঁর মতে মানুষ বাহ্য তথ্যসমৃদ্ধ জীবনকে ত্যাগ করতে পারে না, আবার সত্যের অভিমুখী না হয়েও থাকতে পারে না।[২৬] কারণ তথ্য মানুষের মূলধন, কিন্তু সত্য হল মানুষের ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্যের চূড়ান্ত অভিমুখ মাহাত্ম্য অনুভবের দিকে, অভাব দূরীকরণের দিকে নয়। তাই ঐশ্বর্য্যকামী মানুষ বলেছে সমগ্রেই সুখ, অংশে নয়।[২৭] ঐশ্বর্য্য স্বরূপ উপলব্ধিকে লক্ষ্য করে। কিন্তু স্বরূপোপলব্ধি তো সহজে হওয়ার নয়। কারণ মানবস্বরূপে দ্বৈততা রয়েছে। একদিকে মানুষ তথ্য অভিমুখী, অন্যদিকে ঐশ্বর্য্যকামী। মানুষের যে জৈবিক সত্তা তা তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সেখানে সে তার প্রয়োজনীয় অথ্যের প্রাপ্তির মধ্যেই সুখী। কিন্তু অন্তরে সে সত্তা রয়েছে যার অভিমুখ সমগ্রসত্তা তথা বিশ্ব মানবতার দিকে সে অল্পে সুখী হতে চায় না, সে চায় সমগেকে।[২৮] সে চায় স্বরূপ উপলব্ধি করতে। কিন্তু স্বরূপোপলব্ধির পথ সহজ নয়। অত্যন্ত কঠিন।

কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে গিয়ে আত্মোপলব্ধি বা আত্মজ্ঞান লাভের পথ যে কত দুর্গম তা ব্যক্ত করেছেন। তিনি নচিকেতাকে বললেন, জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতে আত্মজ্ঞানের পথ ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুর্গম ও দূরতিক্রম্য, তাই তুমি ওঠো, মোহানিদ্রা ত্যাগ করে জাগো এবং প্রকৃত আচার্যের সমীপে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করো।[২৯] সুতরাং মানুষের যে স্বরূপোপলব্ধির পথ যা আদর্শের অভিমুখী তার সঙ্গে অথ্যের বাঃ বাস্তবের নিয়ত দ্বান্দ্বিকতা রয়েছে। মানুষের জীবভাব তথ্যকামী, আর ভূমাভাব আদর্শের অভিমুখী। দুটি স্বভাবই মানুষের রয়েছে। একটি স্বভাব তার ব্যক্তিগত, আরেকটি তার ভূমা স্বভাব।[৩০] উপনিষদের ভাষায় বললে, মনুষ্য স্বভাবে শ্রেয় ও প্রেয় দুটিই বর্তমান। 'শ্রেয়'-এর অর্থ যা কল্যাণকর এবং 'প্রেয়' অর্থ যা প্রীতিকর। যা সহজলতা কিন্তু অনিত্য এবং অন্তিমে দুঃখজনক তা হল প্রেয়। আর যা সহজলভ্য নয় শ্রমসাপেক্ষ, কিন্তু নিত্যসুখদায়ক তা হল শ্রেয়। প্রেয় অর্জনের পথ সরল, কিন্তু শ্রেয় অর্জনের পথ অত্যন্ত দুর্গম। কঠোপনিষদে যমদেব নচিকেতাকে বলেছেন, শ্রেয় ও প্রেয় দুটি ভিন্ন বস্তু এবং উভয়ের প্রয়োজন ভিন্ন। প্রেয়-র আবশ্যকতা ক্ষণিক সুখভোগে, আর শ্রেয়-র প্রয়োজন মুক্তিলাভ। শ্রেয় গ্রহণকারীর কল্যাণ হয়, আর প্রেয় বরণকারী পরম সত্য হতে বিচ্যুত হয়।[৩১] এজন্য স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি শ্রেয় ও প্রেয়কে ভিন্নার্থে গ্রহণ করেন। প্রবৃত্তি জন্য আমরা যা কামনা করি সেই প্রেয়বস্তু অর্জনের ইচ্ছা এবং বিবেকজন্য ঔচিত্য অর্থাৎ শ্রেয়কে পাওয়ার ইচ্ছাও মানুষের স্বভাবান্তর্গত। শ্রেয়-কে যে ব্যক্তি গ্রহণ করেন তাঁর সাধুতা বা কল্যাণ হয় এবং প্রেয় কে যে ব্যক্তি ঐকান্তিকভাবে বরণ করেন তিনি স্বরূপার্থ হতে বিচ্যুত হন।[৩২] ঐকান্তিকভাবে প্রেয় অবলম্বনকারী মনুষ্যত্বহীন হয়ে পড়েন।[৩৩] সর্বজনীন সর্বকালীন মনুষ্যত্বের অনুভবই সাধুতা, আর সার্বিক মনুষ্যত্বের অনুভব হতে বিচ্যুত হওয়াই হল স্বরূপার্থহীবতা।[৩৪] মানুষের যে ব্যক্তিগত ভাব যার অভিমুখ প্রেম-এর দিকে তা অহংঙ্কারের দ্বারা আবৃত এবং তার বাইরে যে ভুমাভাব তার লক্ষ্য মুক্তি।[৩৫] ব্যক্তিগতভাব যা ক্ষুদ্র আমি (অহং) তে আবদ্ধ তা অহঙ্কারময়, তার যে দিকে তার স্বরূপজ্ঞান (আত্মা) তার সার্থকতা সমগ্র। একদিকে সে স্বার্থসিদ্ধিতে গৌরব অনুভব করে, আর এর বিপরীত দিকে সে ভূমাতে পূর্ণতাতে গৌরবান্বিত হয়। প্রেম, মৈত্রী, কল্যাণ, নান্দনিকতা, উদারতা প্রভৃতি মানুষের আত্মার প্রকাশক এবং এগুলির দ্বারাই মানুষ তার জীবভাবকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবকে উপলব্ধি করে।[৩৬]

অদ্বৈতবেদান্তীর ন্যায় রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, মানুষ অজ্ঞান জন্য (রবীন্দ্রনাথে মতে স্বার্থজন্য) আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে বাহ্যজগতে নিজের সন্ধান করে। ব্যক্তিমানুষের মধ্যেই যে পরম মানব রয়েছে তার অনুভব না করে মানুষ বাইরে তা অনুসন্ধান করে।[৩৭] মানুষ তার অন্তরে যে সর্বজনীন মনুষ্যত্ব রয়েছে তার অনুভব না করে বহির্জগতে তার সন্ধান করতে গিয়ে পরোক্ষভাবে নিজেকেই পর করে দেয় এবং এটাই তার হীনতার কারণ।[৩৮] কবিগুরুর সঙ্গীতেও তা প্রকটিত হয়েছে-

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে
দেখতে আমি পাই নি।
বাহিরপানে চোখ মেলেছি,
হৃদয়পানেই চাই নি।"[৩৯]

আবার জীবনসায়াহ্নে উপনীত হয়ে কবি অন্তরের মধ্যেই সর্বজনীন মনুষ্যত্বকে পরমসত্যকে উপলব্ধির কথা বলেছেন-

"সত্যেরে সে পায়
আপন আলোক ধৌত অন্ত্রে অন্তেরে।"[৪০]

কখনও তিনি আবার তাঁর গীতিতে অন্তরতমের জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন-

"মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে।
একেলা রয়েছে নীরব শয়ন-'পরে
প্রিয়তম হে জাগো জাগো।"[৪১]

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের অন্তরে যে সার্বিক রয়েছে তার উপলব্ধির দ্বারা বিশ্বমানবতার উপনীত হওয়াই সত্য। সত্য মানুষের অন্তরেই রয়েছে, প্রয়োজন তান প্রকাশ। তাই তিনি 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাতে বলেছেন- "সেই সত্য যা রচিবে তুমি,...।"[৪২] তাঁর মতে, সত্য হল সর্বব্যাপি মনুষ্যত্ব, যা মানুষের অন্তর্স্থিত।

রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা স্বামীজির-"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,/ মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়। বহুরূপে সম্মুখে তোমার/ ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?/ জীবে প্রেম করে যেই জন,/ সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" এই গীতির সঙ্গে অনেকখানি সঙাতিপূর্ণ। তার স্বামীজির দৃষ্টিভঙ্গী অদ্বৈতবাদী। তাঁর মতে জীব ব্রহ্মস্বরূপ, তাই মানুষের কল্যাণের দ্বারাই ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি হয়। স্বামীজি অদ্বৈত মতাবলম্বনে ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে মনুষ্যত্বকেই সত্য বলেছেন এবং ব্রহ্মকে পরমসত্য (সত্যস্য সত্যম্) বলেছেন। এটি হল অদ্বৈতবেদান্তী মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবিষয়ক মতের তাত্ত্বিক প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সত্যের ধর্ম বলতে বোঝায় মাবুষের মধ্যে যে সত্য তারই ধর্ম্ম, মানুষের মধ্যে যে মহৎ, তাঁরই ধর্ম্ম।"[৪৩] এই বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর মতে মনুষ্যত্বই সত্য। আর মানুষের এই মনুষ্যত্ব ধর্মের উপলব্ধি বা স্বরূপোপলব্ধি তখনই হয় যখন মানুশ শুদ্ধচিত্তে জনকল্যাণে নিজেকে ব্যাপৃত করে।[৪৪] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে, অহং মুক্ত হয়ে চিত্তশুদ্ধ হলে মানুষ আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে।[৪৫] এখানেও রবীন্দ্রনাথের মত অদ্বৈতমতের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে প্রভেদ হল রবীন্দ্রনাথের মতে আত্মস্বরূপোপলব্ধি হল সর্বজনীন মনুষ্যাত্বের অনুভব, কিন্তু অদ্বৈতমতে স্বীয় আত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান। অদ্বৈতমতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, কিন্তু অজ্ঞানজন্য জীব স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়। অজ্ঞান নিবৃত্ত হলে স্বরূপজ্ঞান হয়। একেই অদ্বৈত সিদ্ধান্তে মোক্ষ বলে। অদ্বৈত মতে চিত্তশুদ্ধ হলে ঐ শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানলাভের উপযোগী হয়। তখন ব্রহ্ম বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান হলে অজ্ঞান দূরীভূত হয়ে জীবের প্রাপ্ত ব্রহ্মস্বরূপেরই উপলব্ধি হয়। এজন্য অদ্বৈতমতে মুক্তি বাঃ মোক্ষ হল প্রাপ্তের প্রাপ্তি। আর রবীন্দ্রনাথের মতে, সর্বজনীন মনুষ্যত্বের উপলব্ধিই মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথের মতে মানবসত্তার দুটি দিক- একটি ব্যক্তিগত এবং অন্যটি ভূমাগত, ইহা পূরেই ব্যক্ত হয়েছে। ব্যক্তিগত দিকটি হল অহং এবং ভূমাগত দিক হল আত্মা। অহং সত্তা প্রদীপের সঙ্গে তুলনীয় এবং আত্মা শিখা তুল্য। প্রদীপের মূল্য তার উপাদান সাপেক্ষে। কিন্তু শিখা স্বপ্রকাশ ও পরপ্রকাশক। প্রদীপের পরিচ্ছেদকে অতিক্রম করে শিখা সমগ্রে প্রবেশ করে।[৪৬] ব্যক্তিমানুষ হল প্রদীপস্বরূপ যা শিখারূপ আত্মার আলোকে আলোকিত। ব্যক্তি মানুষের মধ্যে যখন শিখারূপ তাত্মা তথা মনুষয়ত্ব প্রজ্জ্বলিত হয় তখন তার অহঙ্কার সঙ্কুচিত হয়।[৪৭] মনুষ্যত্বের আলোকেই ব্যক্তি মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধির জাগরণ ঘটে যে শুভবিদ্ধি ব্যক্তি মানুষকে সমগ্র মানবসত্তায় মিলিত করে।[৪৮]

স্বার্থান্ধিত ব্যক্তিমানুষ এবং মনুষ্যত্ববিশিষ্ট পরম মানুষ- এই দুটি সত্তার মধ্যে সঙ্গতিবিধান করতে গিয়ে মানুষের মনে যে বিভিন্ন অবস্থা তৈরি হয়েছে সেগুলিই বিভিন্ন ধর্ম্মতন্ত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছে।[৪৯] এর থেকে এটা প্রকটিত হয় যে, রবীন্দ্রনাথ আচারসর্বস্ব ধর্ম মানেননি। তিনি মানুষের ধর্মে বিশ্বাসী। মনুষ্যাত্বের

উপলব্ধিই তাঁর পক্ষে ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ আদর্শরূপে ধর্ম এবং ধর্ম্মমত দুটিকে প্রভেদার্থে বুঝেছেন। তাঁর মতে আদর্শ ধর্ম নিত্য, কিন্তু ধর্মমত অনিত্য।[৫০] ধর্মের আচারসর্বস্বতার প্রতি ইরোধিতা করে তিনি বলেছেন, প্রতীটি ধর্ম সম্প্রদায় ভ্রান্তিবশতঃ স্ব স্ব মতকেই ধর্ম্মে বলে ভাবে এবং তার দ্বারা ধর্মের প্রতিই আঘাত করে। ফলস্বরূপ সমাজের অনিষ্টতা ও অপসংস্কার তৈরী হয়।[৫১] অর্থাৎ যা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সমাজে অশান্তির বাতারবণ সৃষ্টি করে তা কখন ধর্মের আদর্শ হতে পারে না। ধর্ম মানুষের মধ্যে ঐক্যের সহায়ক হবে, বিচ্ছিন্নতার নয়। মানুষের ধর্ম সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না, তার অভিমুখ সমগ্রে ভূমায়। তাঁর ভাষায়-"সাম্প্রদায়িক দেবতা তখন বিদ্বেষবুদ্ধির, অহঙ্কারের, অবজ্ঞাপরতার, মূঢ়তার দৃঢ় আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়, শ্রেয়ের নামাঙ্কিত পতাকা নিয়ে অশ্রেয় জগদ্ব্যপী অশান্তির প্রবর্ত্তন করে,- স্বয়ং দেবত্ব অপমানিত ও পরস্পর ব্যবহারে আতঙ্কিত করে রাখে।"[৫২] সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে যে ধর্ম মানুষে মানুষে বিদ্বেষ তৈরি করে, যা সমাজে অশান্তির ঝড় তোলে, যা মানুষকে সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ করে তা ধর্ম নয়, মোহ। বিশ্বজনীন মনুষ্যত্ব-র উপলব্ধিই তাঁর মতে ধর্ম। চণ্ডীদাদের কথায়-

"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।"[৫৩]

রবীন্দ্রনাথ মানবধর্মে বিশ্বাসী। তিনি মনুষ্যত্বের জাগরণ চেয়েছেন। 'শিশুতীর্থ' কবিতায় তিনি মানুষের জয়গান ঘোষণা করেছেন। তিনি লিখেছেন-

"জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই
চিরজীবিতের!"[৫৪]

জীবনের শেষ সময়েও মানবতাবাদী কবির লেখনীতে উঠে এসেছে-

"ওই মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত ধূলির ঘাসে ঘারে"।[৫৫]

উপর্য্যুক্ত আলোচনা হতে অনুসৃত হয় যে, রবীন্দ্রনাথের মতে জগতের সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতা মানব অস্তিত্ব সাপেক্ষ। মানুষ ব্যতিরেকে বিশ্বজগৎ অপূর্ণ। মানুষের মধ্যে ব্যক্তিসত্তা ও বিশ্বসত্তা ও বিশ্বসত্তা বিদ্যমান এবং ঐ দ্বৈতসত্তার দ্বান্দ্বিকতা হতে বিভিন্ন ধর্মের উত্থান ঘটেছে, তা রবীন্দ্রনাথের মতাবলম্বনে এই নিবন্ধে প্রদর্শিত হয়েছে। তাঁর মতে প্রকৃত মনুষ্যাত্বে উত্তরণই আদর্শ ধর্ম এবং তদ্ব্যতিরিক্ত যে ধর্মমত তা আচারসর্বস্বতা। নিবন্ধটিতে দেখানো হয়েছে, আমিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্ব আমি-তে উপনীত হওয়াকেই রবীন্দ্রনাথ মুক্তি বলেছেন। বিশ্ব আমি-র অনুভব মানুষের অন্তর্জাত বা বিবেকজাত, তাও নিবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মনুষ্যত্ব ভাবনা যে ঔপনিষদীয় বৈদান্তিক মতের সঙ্কে অংশতঃ সঙ্গতিপূর্ণ তা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। নিবন্ধটিতে আরও দেখানো হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের মতে অহংকার যেমন মানুষের স্বাতন্ত্র্যতার প্রয়োজক তেমনই তা ঐক্যেরও দ্যোতক। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের অন্তর্স্থিত সর্বজনীন মনুষ্যত্বের অনুভবই মানুষকে বিশ্বমানবতায় উত্তীর্ণ করে, তা এই নিবন্ধে প্রদর্শন করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ মানবতার পূজারী। তিনি অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের অন্তরস্থলে পৌঁছাতে চেয়েছেন। নিজেকে মানুষের সঙ্গে একাত্ম করতে উদ্যোগী হয়েছেন। তাই মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক...।"[৫৬]

গ্রন্থ-উদ্ধৃতি (**References):**

১। মানুষের ধর্ম্ম, পরিশিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য, পৃ. ১০৩-১০৪, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৩৩।
২। শ্যামলী, আমি কবিতা দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩। জগতে সর্বত্রই মানুষ সাহিত্যের দ্বারা হৃদয়ের এই চিহ্নগুলি যদি না কাটিত তবে জগৎ আমাদের কাছে আজ কত সংকীর্ণ হইয়া থাকিত ...। মানুষের সাহিত্য হৃদয়ের আবিষ্কারচিহ্নে জগৎকে মণ্ডিত করিয়া তুলিযাছে।
-রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, দর্শনচিন্তা, রবীন্দ্র রচনা সংকলন...পৃ.৫৯/৩১-৩৬, সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড়, কলকাতা, ১৪১৭।
৪। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ স্বভাব।
-মানুষের ধর্ম্ম, পৃ.৩০/৭, পূর্বসংস্করণ।
৫। মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর একটা বিশ্বভাব।
-ঐ, পৃ. ৩/৭-৮
৬। মানুষ যেদিকে সেই ক্ষুদ্র অংশগত আপনার উপস্থিতকে প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করে সত্য, সেইদিকে সে মৃত্যুহীন,... বূপদান করে সকলের আনন্দকে।
- ঐ, পৃ. ৩-৪
৭। যে-পরিমাণে তার গতি এর বিপরীত দিকে, ব্যহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সঙ্কীর্ণ পার্থক্যের দিকে, মানবসত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট।
-ঐ, পৃ. ৪/৬-৯
৮। যেদিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, সেদিকে তার পূর্ণতা, যেদিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেচে, যেদিকে বিশ্বমানব।
-ঐ, পৃ.৩/ ১৪-১৬
৯। মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। .... সেখানে সে জীবনরূপে বাঁচতে চায়।
-ঐ, ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য, ১-৪
১০। কিন্তু মানুষের আর একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি, তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা।
-ঐ, ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য, ৫-৮
১১। মানুষের চিত্তবৃত্তির যে ঔৎসুক্য মানুষের পূর্ণ সত্যের সাক্ষ্য দেয় সেইখানেই অনুভব করি তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থেকে মুক্তি। সেইখানে সে বিশ্বাভিমুখী।
-ঐ, পৃ.৭/৫-৮
১২। মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎ মানুষ হয়ে উঠচে, তার সমস্ত শেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎ মানুষের সাধনা। এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।
-ঐ পৃ. ২/৭-১১

১৩। সেখানে বর্ত্তমান কালের জন্যে বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দী আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। ...সেখানে, আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।
-ঐ, ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৮-১৩
১৪। ইতিহাসে দেখা যায় মানুষের আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে যে অন্ত্রের দিকে তার বিশ্বজনীনতা, সেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌঁছেচে বিশ্বমানসলোকে, যে লোকে তার বাণী, তার শ্রী, তার মুক্তি।
-ঐ, পৃ. ২/১২-১৬
১৫। তপস্যা বাহ্যানুষ্ঠানে নয়, সত্যই তপস্যা, গীতার ভাষায় ঘোষণা করলে দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়।
-ঐ, পৃ. ২/১৯-২০
১৬। যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার জানে, সেই জানে সেই জানে সত্যকে।
-ঐ, পৃ .৩/৪-৬
১৭। মানবিক সত্তাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তা, তাঁকে প্রিয় বলা বা কোনো কিছুই বলার কোনো অর্থ নেই। তিনি ভালোমন্দ সুন্দর অসুন্দরের ভেদবর্জ্জিত।
-মানুষের ধর্ম্ম -২, পৃ. ৪৬/৪-৭, পুর্ব সংস্করণ।
১৮। ... বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ ঐক্য নেই।
-রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, মানুষ অংশ দ্রষ্টব্য, পৃ. ৭৬/২৭, পূর্ব সংস্করণ।
১৯। কেননা ভগবান ওই যে অহঙ্কারটি জুড়ে দিয়ে আমাদের জগতের সঙ্গে ভেদ জন্মিয়ে দিয়েছেন তাতে আমাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন।... কি করলে নানা মানূশের নানা অহংকারকে সাজিয়ে একটি বিচিত্র সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হতে পারে এই চেষ্টায় এই তপস্যায় পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।
-ঐ, পৃ.৭৭/১২৯-৩৪
২০। নিখিল সৃষ্টি থেকে এই অহংকারের মধ্যে নির্বাসিত হওয়াতেই তার এই নিজের দৃষ্টির এত অধিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। মানূষের ইতিহাসে কেবলই এই সৃষ্টির ইতিহাস, এই সমন্ধয়ের ইতিহাস, তার সমস্ত ধর্ম ও কর্ম, সমস্ত ভাব ও কল্পনার মধ্যে কেবলই এই আমিলের মেলবার ইতিহাস রচিত হচ্ছে।
-ঐ, পৃ. ৭৭-৭৮
২১। -ঐ, পৃ. ৭৮/১৬-১৭
২২। এই ভেদ ঐক্যের সামঞ্জস্যের জন্যে আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা। আমরা এর কোনোটাকেই ছাড়তে চাই নে। আমাদের কিছু প্রয়াস, ... দুইয়ের মধ্যেই এককে এককে লাভ করবার জন্যে।
-ঐ, পৃ. ৭৯/ ৪-৭
২৩। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্ত্বা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একতা আন্তরিক আহ্বান।
-মানুষের ধর্ম্ম-১, পৃ. ৩/১২ -১৩, পূর্বসংস্করণ।
২৪। এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দ্দেশ। কোনদিকে নির্দ্দেশ? যেদিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যেদিকে তার পূর্ণতা, যেদিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেচে, যেদিকে বিশ্বমানব।

-ঐ, পৃ.৩/১৩-১৬
২৫। নৈবেদ্য, ৩০ সংখ্যক কবিতা , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২৬। প্রত্যক্ষ তথ্যকে উপেক্ষা করলে মানুষের চলে না, আবার সত্যকেও নইওলে নয়।
-মানুষের ধর্ম্ম-১. পৃ. ২২/৪-৫, পূর্ব সংস্করণ।
২৭। ... তথ্য মানুষের সম্বল, কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্যের চরম লক্ষ্য অভাব দূর করা নয়, মহিমা উপলব্ধি করানো। তাই ঐশ্বর্য্য- অভিমানী মানুষ বলেচে,.. অল্পে সুখ নেই, বৃহতেই সুখ।
-ঐ, পৃ. ২২/৬-১১
২৮। ... মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে। তার যে সত্তা জীবসীমার মধ্যে সেখানে যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুতেই তার সুখ। কিন্তু অন্তরে অন্তরে জীবমানব বিশ্বমানবে প্রসারিত, সেইদিকে সে সুখ চায় না, সে সুখের বেশি চায়, সে ভূমাকে চায়।
-ঐ, পৃ. ২২-২৩
২৯। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।।
-কঠোপনিষৎ ১/৩/১৪
৩০। একটা স্বভাব তার নিজেকে নিয়ে আর একটা স্বভাব তার ভূমাকে নিয়ে।
-মানুষের ধর্ম্ম-১, পৃ. ৩০/১৫-১৬
৩১।অন্যচ্ছ্রেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবিতি
হীয়তেহর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে।।
-কঠোপনিষৎ ১/২/১
৩২। প্রবৃত্তির প্রেরণার আমরা যা ইচ্ছা করি সেই প্রেয়ের ইচ্ছা মানুষের স্বভাবে বর্তমান, আবার যা ইচ্ছা করা উচিত সেই শ্রেয়ের ইচ্ছাও মানুষের স্বভাবে। শ্রেয়কে.... বলে সাধু হওয়া।... অপরপক্ষে প্রেয়কে একান্তরূপে বরণ... আপন অর্থ থেকে হীন হওয়া।
-মানুশের ধর্ম্ম- ১, পৃ. ৩১/ ৯ -২০, পূর্বসংস্করণ।
৩৩। তেমনি একান্তভাবে প্রেয়কে করলে মানুষ বলতে যা বোঝায় সেই সত্য হীন হয়ে যায়।
-ঐ, পৃ. ৩২/ ১-৩
৩৪। নিজের মধ্যে সর্ব্বকালীন বিশ্বভূমীন মনুষ্যধর্ম্মের উপলব্ধিই সাধুতা, হীনতা সেই মহামানবের উপলব্ধি থেকে বিচ্যুত হওয়া।
-ঐ, পৃ. ৩২/৩-৫
৩৫। মানুষের একটা স্বভাবে আবরণ অন্য স্বভাবে মুক্তি।
-ঐ, পৃ. ৩২/২২
৩৬। তাই মানুষের যে সংসার তার অহং-এর ক্ষেত্রে, সেদিকে তার অহঙ্কার ভূরিতায়, যেদিকে তার আত্মা সেদিকে তার সার্থকতা ভূমায়। একদিকে তার গর্ব্ব স্বার্থসিদ্ধিতে, আর একদিকে তার গৌরব পরিপূর্ণতার।

সৌন্দর্য্য, কল্যাণ, বীর্য, ত্যাগ প্রকাশ করে মানুষের আত্মাকে, অতিক্রম করে প্রাকৃত মানুষকে, উপলব্ধি করে জীবমানবের অন্তরতম বিশ্বমানবকে।
-ঐ, পৃ. ৩৭/৬-১৩
৩৭। আপনারি পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়।
-ঐ, পৃ. ৩৮/ ৪-৫
৩৮। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খূঁজতে গিয়ে অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে।
-ঐ, পৃ. ৩৮। ১১-১৩
৩৯। গীতিমাল্য/৯২, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভাবতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৯৪৬।
৪০। শেষ লেখা/ ১৫, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৯৩।
৪১। গীতবিতান, পূজাপর্ব/৩৯, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪২। কথা ও কাহিনী, (কাহিনী অংশ)।
৪৩। মানুষের ধর্ম্ম-২,
-পৃ. ৬৪/১৯-২০, পূর্বসংস্করণ।
৪৪। মানুষ আপনার স্বভাবকে তখনি জানে যখন পাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে কল্যাণের অর্থাৎ সর্ব্বজনের হিতসাধনা করে।
-ঐ, পৃ. ৬৬/৮-১০
৪৫। যে পাপ অহংসীমাবদ্ধ স্বভাবের, তার থেকে বিরত হোলে তবে মানুষ আপনার আত্মিক সমগ্রকে জানে, তখনি জানে আপনার প্রকৃতি।
-ঐ, পৃ. ৬৬/১৪-১৬
৪৬। আপন সত্তার পরিচয়ে মানুষের ভাষায় দুটি নাম আছে। একটি অহং, আর একটি আত্মা। প্রদীপের সঙ্গে একটিকে তুলনা করা যায় আর একটিকে শিখার সঙ্গে। প্রদীপ আপনার তেল সংগ্রহ করে। আপনার উপাদান নিয়ে প্রদীপের বাজারদর, কোনোটার দর সোনার, কোনোটার মাটির। শিখা আপনাকেই প্রকাশ করে এবং তারই প্রকাশ আর সমস্তও প্রকাশিত। প্রদীপের সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে সে প্রবেশ করে নিখিলের মধ্যে।
-ঐ, পৃ. ৬০-৬১
৪৭। মানুষের আলো জ্বালায় তার আত্মা, তখন ছোটো হয়ে যায় তার সঞ্চয়ের অহঙ্কার।
-ঐ, পৃ. ৬১/৫-৬
৪৮। যে বুদ্ধিতে আমরা সকলে মিলি সেই বুদ্ধিই শুভবুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই আত্মার।
-ঐ, পৃ. ৬১/ ১৯-২০
৪৯। ... মানুষের অন্তরে একদিকে পরমমানব আর এক দিকে স্বার্থসীমাব্ধ জীবমানব, এই উভয়ের সামঞ্জস্য চেষ্টাই মানবমনের নানা অবস্থা অনুসারে নানা আকারে প্রকারে ধর্ম্মতন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত।
-ঐ, পৃ. ৬৮-৬৯
৫০। ...ধর্ম্মের নিত্য আদর্শকে শ্রদ্ধা করি ব'লেই ধর্ম্মমতকেও নিত্য বলে স্বীকার করতে হবে এমন কথা বলা চলে না।
-ঐ, পৃ. ৫৯/১৯-২১

৫১। ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণত এই ভুলই ঘটে, সম্প্রদায় আপন মতকেই বলে ধর্ম্ম, আর ধর্ম্মকেই করে আঘাত। তারপরে যে বিবাদ, যে নির্দ্দ্যতা, যে বুদ্ধিবিচারহীন অন্ধ সংস্কারের প্রবর্ত্তন হয় মানুষের জীবনে আর কোনো বিভাগে তার তুলনাই পাওয়া যায় না।
-ঐ, পৃ. ৫৮/ ২-৭
৫২। -ঐ, পৃ. ৫৬/১৪-১৮
৫৩। চণ্ডীদাস চরিত, যোগেশচন্দ্র রায় সম্পয়াদিত, প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৪৪।
৫৪। পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থ, শিশুতীর্থ কবিতা দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৫৫। শেষলেখা /৬, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বসংস্করণ।
৫৬। সেঁজুতি, পরিচয় কবিতা দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ- পঞ্জি **(Bibliography):**
১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, পূজাপর্ব / ৩৯
২। তদেব, গীতিমাল্য/ ৯২, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৯৪৬
৩। তদেব, কথা ও কাহিনী (কাহিনী অংশ)
৪। তদেব, নৈবেদ্য, ৩০ সংখ্যাক কবিতা
৫। তদেব, পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থ, শিশুতীর্থ কবিতা দ্রষ্টব্য
৬। তদেব, মানুষের ধর্ম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৩৩
৭। তদেব, শেষ লেখা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৯৩
৮। তদেব, সেঁজুতি, পরিচয় কবিতা দ্রষ্টব্য
৯। তদেব, শ্যামলী, আমি কবিতা দ্রষ্টব্য
১০। রায় সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, দর্শনচিন্তা, রবীন্দ্ররচনা সংকলন, গ্রন্থালয় প্রাইভেট
১১। রায় যোগেশচন্দ্র, চণ্ডীদাস চরিত, প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৪৪
১২। ..... কঠোপনিষৎ